

উত্তর:

রাওলাট সত্যাগ্রহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশদের হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ভারতীয় জনগণ অর্থ ও খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করে। সেই সময় ভারতীয় নেতারা আশা করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি করবে এবং স্বায়ত্তশাসনের দিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের আশা পূরণ না করে উল্টে আরও দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার মনে করেছিল যে ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালে বিচারপতি সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সুপারিশ করে যে সরকারকে এমন বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হোক যার মাধ্যমে তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচার ছাড়াই গ্রেপ্তার ও আটক রাখতে পারবে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে “রাওলাট আইন” পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিচার ছাড়াই দীর্ঘ সময় কারারুদ্ধ রাখতে পারত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির অধিকারও সীমিত করা হয়। ভারতীয় জনগণ এই আইনকে “কালো আইন” বলে অভিহিত করেছিল, কারণ এটি ছিল অত্যন্ত দমনমূলক এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী এই আইনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের আহ্বান জানান। তিনি সত্যাগ্রহ বা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনই ইতিহাসে “রাওলাট সত্যাগ্রহ” নামে পরিচিত। গান্ধীজি জনগণকে হরতাল, উপবাস এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। বহু শহরে দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় এবং মানুষ শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সভার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়।

দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, লাহোর, অমৃতসরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাওলাট সত্যাগ্রহ ব্যাপক সাড়া ফেলে। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও কৃষক সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমবার ভারতের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একসঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয়তাবাদ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কিন্তু আন্দোলনের সময় কিছু স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। পুলিশের দমনমূলক আচরণ ও গুলিচালনার ফলে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়ে। অমৃতসরে ডা. সাইফউদ্দিন কিচলু ও ডা. সত্যপাল নামে দুই জনপ্রিয় নেতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করে গোপনে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনার ফলে অমৃতসরের জনগণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং বিক্ষোভ শুরু হয়। কয়েকটি স্থানে সহিংসতার ঘটনাও ঘটে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবে কঠোর দমননীতি চালু করে।

রাওলাট সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম সর্বভারতীয় গণআন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে অহিংস আন্দোলনের ধারণা সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও আন্দোলনের সময় সহিংসতা দেখা দেওয়ায় গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন, তবুও এই আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি আরও মজবুত করে তোলে। এর ফলে সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং স্বাধীনতার দাবিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা

রাওলাট সত্যাগ্রহ চলাকালীন পাঞ্জাবে যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ভয়াবহ পরিণতি ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সেদিন ছিল বৈশাখী উৎসবের দিন। বহু মানুষ উৎসব উপলক্ষে অমৃতসরে এসেছিল। একই সঙ্গে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে একটি শান্তিপূর্ণ সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। নারী, পুরুষ ও শিশুসহ হাজার হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়। অনেকেই জানতেন না যে ব্রিটিশ সরকার সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করেছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ছিল চারদিক ঘেরা একটি খোলা মাঠ, যেখানে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ ছিল খুবই সংকীর্ণ। বিকেলের দিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছান। তিনি কোনো সতর্কবার্তা না দিয়েই সৈন্যদের গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। সৈন্যরা নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। আতঙ্কিত মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে থাকে, কিন্তু সংকীর্ণ পথের কারণে বের হতে পারেনি। অনেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মাঠের কুয়োতে ঝাঁপ দেয়। প্রায় দশ মিনিট ধরে গুলি চালানো হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৩৭৯ জন নিহত এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়। তবে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা আরও বেশি ছিল বলে মনে করা হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা সমগ্র ভারতকে স্তম্ভিত করে দেয়। এই বর্বর ঘটনার ফলে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি গভীর ঘৃণা জন্ম নেয়। সারা দেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। ভারতীয়রা বুঝতে পারে যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের জীবন ও অধিকারের কোনো মূল্য দেয় না। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া “নাইট” উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে জানান যে এই ধরনের অমানবিক শাসনের সম্মান বহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

গণহত্যার পরে পাঞ্জাবে আরও কঠোর দমননীতি চালু করা হয়। বহু মানুষকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাধারণ মানুষের ওপর বিভিন্ন অপমানজনক শাস্তি আরোপ করা হয়। কোথাও কোথাও মানুষকে রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা হয়। এসব অত্যাচার ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনার তদন্তের জন্য “হান্টার কমিশন” গঠন করে। কমিশন জেনারেল ডায়ারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করলেও তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়নি। এতে ভারতীয়দের মধ্যে আরও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার পর ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সামান্য বিশ্বাসও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

এই গণহত্যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করা বৃথা। ফলে তিনি পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর জাতীয় আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও গণমুখী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ঘটনার নিন্দা করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুরতা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পায়। এই ঘটনার ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে।

আজও জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বেদনাদায়ক স্মৃতি। অমৃতসরের সেই স্থান বর্তমানে একটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতি বছর বহু মানুষ সেখানে গিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই ঘটনা ভারতীয়দের আত্মত্যাগ, সাহস এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

Champan Satyagraha and Kheda Satyagraha. চম্পারণ সত্যাগ্রহ ও খেদা সত্যাগ্রহ।

উত্তরঃ

চম্পারণ সত্যাগ্রহ

চম্পারণ সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের মাটিতে পরিচালিত প্রথম সফল সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারণ জেলায় এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি ভারতীয় কৃষকদের দুর্দশা ও ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহ শুধু একটি কৃষক আন্দোলনই ছিল না, এটি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

চম্পারণ অঞ্চলে ইউরোপীয় নীলকর সাহেবরা কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালাত। সেখানে “তিনকাঠিয়া প্রথা” নামে একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী কৃষকদের নিজেদের জমির একটি নির্দিষ্ট অংশে বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষ করতে হতো। কৃষকরা নীল চাষ করতে বাধ্য হলেও এর বিনিময়ে তারা ন্যায্য মূল্য পেত না। নীল চাষের ফলে জমির উর্বরতা কমে যেত এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তাছাড়া নীলকর সাহেবরা কৃষকদের ওপর নানা ধরনের কর ও অত্যাচার চাপিয়ে দিত।

এই অবস্থায় চম্পারণের কৃষকরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজকুমার শুল্ল নামে এক কৃষক নেতা গান্ধীজির কাছে চম্পারণের কৃষকদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁর অনুরোধে গান্ধীজি ১৯১৭ সালে চম্পারণে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি কৃষকদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের বক্তব্য শোনে এবং তাঁদের ওপর হওয়া অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করেন।

ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজির এই কার্যকলাপকে ভালোভাবে নেয়নি। তাঁকে চম্পারণ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু গান্ধীজি সেই নির্দেশ অমান্য করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কৃষকদের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি চম্পারণ ছাড়বেন না। এর ফলে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থনের কারণে সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পায়নি।

গান্ধীজির নেতৃত্বে কৃষকরা সংগঠিত হতে শুরু করে। আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। কৃষকরা সাহসের সঙ্গে নিজেদের দাবি তুলে ধরতে থাকে। গান্ধীজির শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও জনসমর্থনের ফলে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। গান্ধীজিকেও সেই কমিটির সদস্য করা হয়।

তদন্তের পর সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে নীলকর সাহেবরা কৃষকদের ওপর অন্যায় অত্যাচার চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত “তিনকাঠিয়া প্রথা” বাতিল করা হয় এবং কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না, তবুও এই আন্দোলন কৃষকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিল।

চম্পারণ সত্যাগ্রহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল গান্ধীজির সামাজিক সংস্কারমূলক কাজ। তিনি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন করেননি, গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দিকেও গুরুত্ব দেন। তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করেন। এর ফলে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটে।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন দিশা এনে দেয়। এর মাধ্যমে গান্ধীজি সাধারণ মানুষের নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সফলভাবে সংগ্রাম করা সম্ভব। কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা করেছিল। পরবর্তীকালে গান্ধীজির নেতৃত্বে যে বৃহত্তর আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়, তার ভিত্তি তৈরি হয় এই আন্দোলনের মাধ্যমে।

খেদা সত্যগ্রহ

খেদা সত্যগ্রহ ছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন। ১৯১৮ সালে গুজরাটের খেদা জেলায় এই আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় খেদা অঞ্চলে ভয়াবহ খরা দেখা দেয় এবং ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু এই দুরবস্থার মধ্যেও ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের কাছ থেকে পূর্ণ ভূমিকর আদায়ের চেষ্টা করে। ফলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

খেদার কৃষকরা সরকারের কাছে কর মকুবের আবেদন জানায়। ব্রিটিশ আইনে বলা ছিল যে ফসলের উৎপাদন নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে নেমে গেলে কর মকুব করা যেতে পারে। কিন্তু সরকার কৃষকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এই অবস্থায় কৃষকরা গান্ধীজির সাহায্য চান।

গান্ধীজি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বল্লভভাই প্যাটেল, ইন্দুলাল যাজ্জিক এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেন। গান্ধীজি কৃষকদের আহ্বান জানান যে যতদিন সরকার কর মকুব না করবে, ততদিন তারা কর প্রদান করবে না।

খেদা সত্যগ্রহ সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনেক কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁদের গবাদি পশুও কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু কৃষকরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

গান্ধীজি আন্দোলনের সময় কৃষকদের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বারবার বলেছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই সহিংসতার পথ অবলম্বন করা যাবে না। কৃষকরাও তাঁর নির্দেশ মেনে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার চাপের মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সরকার কর আদায় স্থগিত করতে বাধ্য হয় এবং যেসব কৃষক সত্যিই কর দিতে অক্ষম ছিল, তাদের কর মকুব করা হয়। বাজেয়াপ্ত জমিও অনেক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করেনি, তবুও এই আন্দোলনকে কৃষকদের একটি বড় বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

খেদা সত্যগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকরা বুঝতে পারে যে ঐক্যবদ্ধ ও অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে অন্যায়ে বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করা সম্ভব। এই আন্দোলনে বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। পরবর্তীকালে তিনি “সর্দার” উপাধি লাভ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন।

খেদা সত্যগ্রহ গান্ধীজির নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে অহিংস আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানেও কার্যকর হতে পারে।

চম্পারণ ও খেদা সত্যগ্রহের মধ্যে অনেক মিল ছিল। উভয় আন্দোলনই কৃষকদের সমস্যা কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই গান্ধীজি অহিংস সত্যগ্রহের পথ অনুসরণ করেছিলেন। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শহরকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। সাধারণ কৃষকরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে।

এই আন্দোলনগুলির ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারে যে সংগঠিত ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়ে নীতির বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। চম্পারণ ও খেদা সত্যগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি শক্তিশালী করেছিল এবং পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ ও খেদা সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনি সাধারণ কৃষকদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন এবং অহিংস সত্যাগ্রহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই আন্দোলনগুলি শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল না, এগুলি ভারতীয় জনগণের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ছিল। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চম্পারণ ও খেদা সত্যাগ্রহ চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

India Independence Act, 1947. ভারতের স্বাধীনতা আইন, 1947

উত্তরঃ ভারতের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ ছিল ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই আইনের মাধ্যমে প্রায় দুইশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই আইন পাশ হয় এবং ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে তা কার্যকর হয়। এই আইন শুধু ভারতের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেনি, বরং উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়। ভারতের স্বাধীনতা আইন ছিল দীর্ঘ জাতীয় আন্দোলন, অসংখ্য ত্যাগ ও সংগ্রামের ফলাফল।

উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবি সংগঠিত রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সিভিল অবিডিয়েন্স আন্দোলন, ভারত ছাড়া আন্দোলন প্রভৃতি গণআন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিত দুর্বল করে তোলে। একই সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলন ও কৃষক-শ্রমিকদের সংগ্রামও স্বাধীনতার দাবিকে আরও শক্তিশালী করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ভারত শাসন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয়দের মতামত উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় দেশজুড়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস “ভারত ছাড়া আন্দোলন” শুরু করে। যদিও আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হয়, তবুও ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে ভারতকে আর দীর্ঘদিন শাসন করা সম্ভব নয়। যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে তারা আগ্রহী হয়।

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠায়। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় নির্ধারণ করা। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধের কারণে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা সফল হয়নি। মুসলিম লীগ পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি জানায়। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ “দ্বিজাতি তত্ত্ব” প্রচার করে এবং দাবি করে যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি, তাই তাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন।

এই সময় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বহু মানুষ প্রাণ হারায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এরপর লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন, যা “মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা” নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতকে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে “ভারতের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭” পাশ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল—পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীকালে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এই আইনে বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকারের ভারতের ওপর সমস্ত শাসনক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার লাভ করবে। দুটি দেশের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠন করা হয়, যারা নতুন সংবিধান রচনা করবে। যতদিন না নতুন সংবিধান কার্যকর হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধিত আকারে কার্যকর থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সম্রাটের “ভারতের সম্রাট” উপাধি বিলুপ্ত হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ সরকারের প্রভুত্বও শেষ হয়ে যায়। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অথবা স্বাধীন থাকার অধিকার দেওয়া হয়। তবে বাস্তবে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

এই আইনের ফলে ভারতবর্ষে বিভাজনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে ভাগ করা হয়। সীমানা নির্ধারণের জন্য র‍্যাডক্লিফ কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু সীমান্ত নির্ধারণের কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে উদ্বাস্তু হিসেবে চলে যেতে বাধ্য হয়।

দেশভাগের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। নারী নির্যাতন, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। এই মানবিক বিপর্যয় ভারতের স্বাধীনতার আনন্দকে অনেকাংশে ম্লান করে দেয়।

তবুও ভারতের স্বাধীনতা আইন ভারতীয়দের কাছে এক ঐতিহাসিক বিজয় ছিল। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর বিখ্যাত “Tryst with Destiny” ভাষণ স্বাধীন ভারতের নতুন যাত্রার সূচনা করে।

স্বাধীনতার পর ভারতের সামনে বহু চ্যালেঞ্জ ছিল। দেশভাগজনিত সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তিকরণ ছিল প্রধান সমস্যা। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে।

ভারতের স্বাধীনতা আইন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের প্রতীক। এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতীয়রা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করার অধিকার লাভ করে। একই সঙ্গে এই আইন উপমহাদেশে দেশভাগের করুণ বাস্তবতাও সৃষ্টি করে, যার প্রভাব আজও ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান।

এই আইন ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম দিলেও এটি ছিল মূলত ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি আইন। স্বাধীনতার পর ভারতীয় নেতাদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ভারত সেই চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ শুধু একটি আইনি দলিল নয়, এটি ভারতীয় জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। অসংখ্য শহীদের রক্ত, বিপ্লবীদের ত্যাগ এবং সাধারণ মানুষের অবিরাম আন্দোলনের ফলেই এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। তাই এই আইন ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ও গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।